গণতন্ত্রের গোলকধাঁধা

সাজ্জাদ জহির

আধুনিকতাবাদের মোড়কে ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ময়দানে আদর্শিক আগ্রাসনের মূল ৬টি দর্শনকে আমরা চিহ্নিত করেছিলাম। এই ৬টি দর্শন বা মতবাদ হল —ভোগবাদ, লিবারেলিজম বা উদারনৈতিকতাবাদ, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ, সেক্যুলারিজম ও গণতন্ত্র।

আমরা আরও বলেছিলাম, শত্রুর আদর্শিক হাতিয়ারের সামনে আত্মসমর্পনের মাধ্যমে নিজ আদর্শকে প্রবল করা যায় না। বিগত প্রায় ৫০ বছরের 'ইসলামি' গণতন্ত্র চর্চার নির্মম ইতিহাস তা-ই বলে। গণতন্ত্রের ব্যাপারে অগণিত বিশেষণ থাকলেও, সহজ ভাষায় বলতে গেলে—রিপাবলিক বা "জনসমর্থিত সরকার" পরিবর্তন ও নির্বাচনে অধিকাংশের মতকে প্রাধান্য দেয়াই হচ্ছে গণতন্ত্র।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সিয়াদাহর (সার্বভৌম কর্তৃত্ব, হুকুম, নিয়ন্ত্রণ, প্রভুত্ব, আধিপত্য, বিধান নির্ধারণ) অধিকার দিয়ে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষা থেকে জানা যায় যে, সিয়াদাহ হচ্ছে—সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব (Absolute authority), যার উপর আর কোন কর্তৃত্ব নেই এবং আইন প্রণয়নের একমাত্র অধিকার। গণতন্ত্রে সিয়াদাহ মানুষের জন্য, সিয়াদাহ হচ্ছে জাতির জন্য। অর্থাৎ মানুষ যা চায়, যা সমর্থন করে তার উপর ভিত্তি করেই আইন প্রণয়ন, এবং আইন ও বিচার বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ হবে।

ইসলামপন্থীদের মধ্যে একটি অংশ (জামাত, ইখওয়ান, আন নাহদা) গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় যাওয়ার বা থাকার মেহনত করলেও, বড় একটি অংশ (বিশেষত উলামায়ে কেরাম ও তালেবে ইলম শ্রেণীর সংগঠনগুলো) গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়া প্রয়োজনবোধ করেন মূলত সমাজে ইসলামের পক্ষে কথা বলা বা মুসলিমদের অধিকার রক্ষার প্ল্যাটফর্ম শক্তিশালী করার জন্যে। উভয় শ্রেণী সমান নয়। তবে নিয়ত বা পরিকল্পনা যা ই হোক না কেন; ইসলামপন্থীদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার ফলেঃ—

ক) ইসলামের সরাসরি বিরোধিতাকারী সেক্যুলার শাসনদর্শন দিন দিন আরো শক্তিশালী হয়েছে। ইসলামের পরিবর্তে পশ্চিমাদের দিয়ে যাওয়া নব্যধর্ম 'লিবারেলিজম'—মানুষের রাজনৈতিক চিন্তার পাশাপাশি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাকেও গ্রাস করে নিয়েছে।

খ) শাসক নির্বাচনের শারঈ সম্ভাবনার ব্যাপারে মানুষের অসচেতনতাবোধ গাঢ় হয়েছে। আপামর মুসলিমদের মস্তিষ্ক থেকে তাওহিদের আকিদা বিদায় নিচ্ছে। মানুষ ভাবতেই পারছে না—শাসনকর্তৃত্বের বৈধতা নিচ থেকে নয়, বরং উপর থেকে আসে।

গ) রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র ও পুঁজিপতিদের সমন্বয়ে গঠিত অলিগার্কি বা অভিজাততন্ত্রের (সুনির্দিষ্ট অল্প কিছু লোকের শাসন) অপশাসন ও শোষণ জনজীবনে দুর্ভোগ কেবল বাড়িয়েই চলেছে। আর, হিদায়াতের বাতিঘর ইসলামপন্থীরাও যখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে, তখন মানুষের মধ্যে আত্মসমর্পিত দাসের ন্যায় সব মেনে নেয়া, পূর্ণতা লাভ করেছে।

খোদ ইসলামপন্থীরাই যখন ইউরো-আমেরিকান লিবারেলিজমের অন্যতম 'রুকন' গণতান্ত্রিক গরল আস্বাদনে মত্ত, তখন সাধারণ মানুষ নিজেকে উন্নত মুসলিমে পরিণত করার বদলে আরো আধুনিক প্রমাণে ব্যস্ত হবে, তা বলাই বাহুল্য। আজ ইসলামবিরোধী সেক্যুলার শক্তির অন্যতম আদর্শিক হাতিয়ার গণতন্ত্রের গোলকধাঁধায় দিশেহারা ইসলামপন্থী ও মুসলিমদের বিশাল এক অংশ।

গণতান্ত্রিক মানহাজের প্রস্তাবকেরা বরাবরই গণতন্ত্র কী নয়, এবং গণতন্ত্র কী এনে দিতে পারে —সে আলোচনায় ব্যতিব্যস্ত থাকেন, অন্যদেরও রাখেন। এর মাধ্যমে সরলমনা মুসলিমদের বিমূর্ত কল্পনার মায়াজালে আবিষ্ট করে রাখা যায়।

তাই, গণতন্ত্র কী এবং গণতন্ত্র কী এনে দিয়েছে, সেই আলোচনাটিই আমরা করব; যা কি না চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও অকাট্য যুক্তির বুননে প্রকৃত সত্য অনুধাবনে সহায়ক হবে।

???????? ???????? ???????? ?????????? ??????????!

মাওলানা মওদুদী এবং জামায়াতে ইসলামি-র কর্মপন্থা এবং কার্যক্রমের ব্যাপারে ড. জাভেদ আকবর আনসারির নিচের কথাগুলো প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন:

> পশ্চিমা গণতন্ত্রের মাধ্যমে (বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন এনে 'ইসলামি গণতন্ত্র' নাম দিয়ে) ইসলামি বিপ্লব (অথবা ইসলামের বিজয়, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা, নেযামে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইত্যাদি) অর্জন করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।
>
> পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামির নেতা শাহ নেওয়াজ ফারুকী সাহেব 'জামায়াতে ইসলামির অতুলনীয় গবেষণামূলক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা' শিরোনামে যে আলোচনাটি পেশ করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জামায়াতে ইসলামির শক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,
>
> ১. মাওলানা মওদুদি (রহ.) এর চিন্তাধারা হল: ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা, যা গোটা পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব বিস্তারের দাবি রাখে। জনাব ফারুকী সাহেবের বক্তব্য, 'জামায়াতে ইসলামির শক্তি পৃথিবীর অন্য যে কোনো দলের চেয়ে বেশি।'[1]
>
> ২. ইসলামি দল হিসাবে জামায়াতে ইসলামির আগমনকে কেন্দ্র করে যে সব প্রোপাগান্ডা ছড়ান হয়েছে, তা বাস্তবসম্মত নয়। বরং আদর্শের পরিচয়, প্রতিরক্ষা ও উন্নতির ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামির বড় একটি অবস্থান রয়েছে। অন্যদিকে সেক্যুলার ও কমিউনিস্টরা জামায়াতে ইসলামিকে নিজেদের আসল শত্রু মনে করে।[2]
>
> ৩. জামায়াতে ইসলামি ছাত্র ও শ্রমিক দলগুলো থেকে কমিউনিস্ট ও লিবারেলদের আধিপত্য উপড়ে ফেলেছে।[3]
>
> ৪. জামায়াতে ইসলামি সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও যুদ্ধক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। জামায়াতে ইসলামির সহযোগিতা ছাড়া গণতান্ত্রিক ও ইসলামিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।[4]
>
> ৫. জামায়াতে ইসলামি উম্মতের ঐক্যের প্রতীক। সেইসাথে জামায়াতে ইসলামি গোটা মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার যোগ্যতা রাখে।[5]
>
> ৬. জামায়াতে ইসলামির মধ্যে বারবার নির্বাচনী পরাজয়কে বরণ করার অসাধারণ সক্ষমতা রয়েছে।[6]
>
> (শাহ নেওয়াজ ফারুকী সাহেবের এ মূল্যায়নের ব্যাপারে) প্রথম কথা হল, শক্তি একটি বহুমুখী ধারণার নাম। শক্তির শাব্দিক অর্থ হল, উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হওয়ার যোগ্যতা। জামায়াতে ইসলামির প্রস্তাবিত লক্ষ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে দ্বীনকে প্রবল করা। তারা মনে করেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দ্বীনকে প্রবল করার জন্যে তারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রাধান্য বিস্তার করছে।
>
> কিন্তু বাস্তবতা হল, যত দিন যাচ্ছে এ নেযামটি ততই দুর্বল হয়ে পড়ছে। জামায়াতে ইসলামি অনেক সাধনা করে যে শক্তি অর্জন করেছিল, তা দিনদিন কমেই চলেছে। তারা যদি দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচলিত কার্য পরিকল্পনা পুনঃবিবেচনা না করেন তাহলে অচিরেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তারা নিশ্চিতভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। মুহতারাম ফারুকী সাহেব জামায়াতে ইসলামির যেসব শক্তির কথা আলোচনা করলেন, সেগুলো পর্যালোচনা করলে জামায়াতে ইসলামির কর্মপদ্ধতির দুর্বলতাগুলো আরো পরিস্কার হয়ে যাবে।
>
> এ কর্মপদ্ধতির দুর্বলতার মূল কারণ হল, মাওলানা মওদুদি (রহ.) পশ্চিমাকে দর্শনকে নিরেট জাহিলিয়্যাত সাব্যস্ত করলেও,

পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও কর্মপদ্ধতির উপর তিনি যে পর্যালোচনা পেশ করেছেন তা অপরিপূর্ণ ও আবেগী একটি পর্যালোচনা ছিল। মাওলানা মওদুদি রহ এর আবেগী পর্যালোচনার সবচে’ বড় দৃষ্টান্ত তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার মধ্যেই বিদ্যমান। তিনি ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থারূপে পেশ করেছেন ঠিক; কিন্তু এই জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও অন্যান্য সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানগুলোকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেছেন। যা নিতান্তই পরস্পরবিরোধী একটি অবস্থান। কেমন যেন, আগুনের মাঝে পানির সন্ধান করা। তিনি যে ইসলামি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছেন তার একটি সীমাবদ্ধতা হল, ‘ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ধ্বংস হওয়া জরুরী’, এটি তিনি মনে করতেন না। বরং তিনি এধরণের সরকারব্যবস্থাকেই দ্বীন বিজয়ের মাধ্যম হিসেবে জোর দিয়েছেন।

তিনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি ও সেক্যুলার শাসনব্যবস্থাকে গতানুগতিক সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানসমূহের মত মনে করেন না। বরং ইসলামি নেতৃত্বের রূপরেখার আলোচনার সময় গণতান্ত্রিক ধারার সম্রাটদের ব্যাপারে মুরতাদ হওয়ার কথা বললেও গণতন্ত্রের ব্যাপারে রিদ্দাহর ফাতওয়া দেন না। তাঁর মতে খেলাফতে রাশেদাও শরীয়াহভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না! যা কিনা মাওলানার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে অনবগতিরই পরিচায়ক।

মাওলানা মওদুদির চিন্তাধারাকে সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামি যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে (চাই তা পাকিস্তানে হোক, বাংলাদেশে হোক কিংবা ভারতে), প্রকৃতপক্ষে তা এই চিন্তাধারার ত্রুটিগুলো দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এই চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে পরের ১৩০০ বছর যে ইসলামি শাসন যেভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা কোনোদিন ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এটি উল্টো সেক্যুলার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে ইসলামি শাসনব্যবস্থা নাম দিয়ে জায়েয সাব্যস্ত করার নামান্তর।

…এ আশঙ্কার কথা মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী ১৯৫৭ সালে আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেন,

“কত দল অস্তিত্ব লাভ করছে মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য; কিন্তু দলগুলো প্রতিষ্ঠা লাভের পর ধাপে ধাপে তা নিজেই স্বতন্ত্র একটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, আর আসল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।”

তাই প্রশ্ন করা প্রয়োজন —আমরা কি সংগঠন বা মাসলাকের কর্তৃত্ব চাই, না ইসলামের কর্তৃত্ব চাই? আজ জামায়াতে ইসলামি নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সেক্যুলার শক্তিগুলোর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া থেকে পালাতে শুরু করেছে। ড. আনসারি আরও বলেছেন,

এ থেকে প্রমাণ হয়, কর্মীদের মধ্যে ইসলামের মজবুতিতে ভূমিকা রাখার এবং শাহাদাতের আগ্রহ নিঃশেষ হতে শুরু করেছে। যত দিন যাবে সেক্যুলারাইজেশন জামায়াতে ইসলামিকে ততই একটি সাধারণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে থাকবে। চলমান প্রক্রিয়ায় জামায়াতে ইসলামির শক্তি বেড়েও যেতে পারে। এখানে বেড়ে যাবার অর্থ হল ইসলামের নামে গণতান্ত্রিক কাজকর্মকে জনসাধারণের সবাই মেনে নিবে। তবে এভাবে শরীয়াহর বিধান প্রতিষ্ঠা হবে না। কেননা, জনসাধারণের খাহেশাতের অনুগমন আবশ্যকীয়ভাবে আল্লাহর ইবাদতকে নাকচ করে দেয়। জামায়াতে ইসলামির বরং সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ইসলামি শাসনের অধীনস্ত হওয়ার যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা দরকার।

গণতান্ত্রিক মেহনত আদতে জনগণের প্রবৃত্তিপূজারই বহিঃপ্রকাশ। আর জনগণের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব ও খাহেশাতের দিকে মনোযোগ দেয়া—রবের ইবাদত ও সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে উন্নতি দান করতে পারে না, বরং তা উদগ্র স্বাধীনতা ও প্রবৃত্তির ঘোড়া ছোটাতে সাহায্য করে।

প্রচলিত গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার সফলতা—চাই তার ধরণ ইসলামি হোক বা গাইরে ইসলামি—আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টাকে উন্নত করতে পারে না। এসব গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখন ব্যাপক হয়, তখন ইসলামি বিপ্লবের প্রচেষ্টা আধুনিক বামপন্থী, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট বা লিবারেল আদর্শের সঙ্গে মিলে যায়। এ কথাটি লিয়াকত আলী খান সাহেব ১৯৪৯ সালে খুব ভালভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তিনি বলেন,

> "পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ইসলামি নাম দিয়ে জায়েয সাব্যস্ত করা, পাকিস্তানে একটি আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে'বড় বাধা।"

তুরস্কের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হয়েছে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে কোনো ইসলামি দল রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে না; বরং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামি দলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আর এ কাজ বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে তো অসম্ভবই; কারণ আমরা নির্বাচনে শুধু হেরেই যাচ্ছি (এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপর বড় ইহসান) ।

এ দিকে আরববিশ্বের বর্তমান অবস্থা ও ফলাফল তো পরিস্কার। যদি একথা সঠিক হয় যে, আরবের ইসলামি আন্দোলনগুলো মাওলানা মওদুদি (রহ.) এর গবেষণার ফসল, তাহলে আমি আবারও বলব যে, এই চিন্তাধারা ও মানসিকতা গোটা মুসলিম বিশ্বে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ইসলামের নাম দিয়ে জায়েয সাব্যস্ত করতে ভূমিকা রেখেছে। অপরদিকে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক বড় অবদান রেখেছে।

এই কথাটি এ বিষয়ের কারণেও পরিস্কার যে, ইসলামি দল, ছাত্র ও শ্রমিক দলগুলোর সাথে সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী দল, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টি বা ইউনিয়নসমূহের ইশতেহার ও কার্যপদ্ধতির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য আজ দেখা যায় না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরভাবে সেক্যুলারিজম বাস্তবায়ন করার সর্বোৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া। গণতন্ত্র যখন থেকে সবার কাছে গৃহীত হতে শুরু করেছে, তখন থেকে দ্বীন ইসলামের মজবুতিও নিঃশেষ হতে শুরু করেছে।[7]

জামায়াতে ইসলামির কর্মপন্থা মানুষকে ধীরে ধীরে সেক্যুলার বানাতে বাধ্য হচ্ছে; কেননা, সেক্যুলার শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কোনো বিষয় গৃহীত হওয়া শুধু জনসাধারণের অধিকার ও স্বার্থের সাথেই নির্ধারিত। আর নিজ অধিকার ও স্বার্থের পেছন দৌড়ানোই হচ্ছে সেক্যুলারিজম। এমন চিন্তাকে উপড়ে না ফেলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইসলামি চিন্তা ধারণ করতে পারে না। এছাড়াও, সেক্যুলার রাষ্ট্রের অন্যতম ভিত্তি গণতন্ত্রকে 'ইসলামি' রূপদানের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামি মুসলিম জনতা ও ইসলামি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সেক্যুলার রাষ্ট্রের উপযোগীই করে তুলছে কেবল।

যার ফলে মানহাজে মওডুদির আলোকে সাংগঠনিক মেহনত, আন্দোলন ইসলামি রাষ্ট্র ফিরিয়ে আনার পথে কেবল ক্রমান্বয়ে প্রতিবন্ধকতাই বৃদ্ধি করে চলেছে![8]

?????, ????????? ? ??????? !

ব্রিটিশরা চলে যাবার পর, তাদেরই রেখে যাওয়া ওয়েস্টমিনিস্টার গণতন্ত্রের (প্রধানমন্ত্রী শাসিত সংসদীয় গণতন্ত্র) আদলেই ১৯৪৭ সালে ভারত, পাকিস্তান এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সরকার গঠিত হয়। আমরা জানি বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান সরকার তিনটি বিভাগ নিয়ে গঠিত হয়- ১) নির্বাহী ২) আইন ও ৩) বিচার বিভাগ।

√ নির্বাহী বিভাগ, যার নের্তৃত্বে মন্ত্রীসভা ও প্রেসিডেন্ট। সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবিভাগের অধীনে। যেমন- সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র, এনবিআর, দুদক, ইলেকশন কমিশন ইত্যাদি।

√ আইন বিভাগ বা সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বে।

√ বিচার বিভাগ, প্রধান বিচারপতির অধীনে।

তন্মধ্যে, কেবল আইনবিভাগ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়। আর নির্বাহী বিভাগের অধীনে থাকা বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন, উপজেলা, ওয়ার্ড ইত্যাদি) জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়।

আরো অনেক কথা বলা যায়। সংক্ষেপে বাংলাদেশ সরকারের সাংগঠনিক কাঠামো এরূপ।

অত:পর,

এখন ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান তাত্ত্বিক উস্তাদ আবুল আলা মওদুদি রহ. বলেন—

> "ইসলামের মহান আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় অট্টালিকা তার মূল ও কান্ড থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর শাখা প্রশাখা পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে ধর্মহীন রাষ্ট্র (Secular States) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে থাকে। তার গঠন প্রক্রিয়া, স্বভাব প্রকৃতি সবকিছুই সেক্যুলার রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন এক বিশেষ ধরণের মানসিকতা। এক স্বাতন্ত্রধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এক অনুপম কর্মনৈপূণ্য।
>
> এ রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, কোর্ট কাচারী, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আইন কানুন, কর ও খাজন পরিচালনা পদ্ধতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ, সন্ধি প্রভৃতি সব বিষয়ই ধর্মহীন রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি ইসলামী রাষ্ট্রের কেরানী, এমনকি চাপরাশী হবারও যোগ্য নয়। সে রাষ্ট্রের পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেল (ওএচ) ইসলামী রাষ্ট্রের একজন সাধারণ কনস্টেবল হবারও যোগ্যতা রাখেনা। ধর্মহীন রাষ্ট্রের ফিল্ড মার্শাল এবং জেনারেলরা ইসলামী রাষ্ট্রে সাধারণ সিপাহী পদেও ভর্তি হবার যোগ্যতা রাখেনা। তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো পদ পাওয়া তো দূরের কথা, তার মিথ্যাচার, ধোকাবাজি এবং বিশ্বসাঘাতকতার কারণে হয়তো কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকেও সে রক্ষা পাবেনা।
>
> মোট কথা, ধর্মহীন সেক্যুলার রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী করে যেসব লোক তৈরি করা হয়েছে এবং সে ধরণের রাষ্ট্রের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক, ভোটার, কাউন্সিলার, কর্মকর্তা, সিপাহী, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তা, সেনা প্রধান, রাষ্ট্রদূত, মন্ত্রীবর্গ, মোটকথা নিজেদের সমাজ জীবনের প্রতিটি বিভাগ, পরিচালিকা যন্ত্রের প্রতিটি অংশ সম্পূর্ণ নতুনভাবে নিজস্ব আদর্শের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে হবে।"[9]

এখন আমি বলি,

বাংলাদেশ সরকার (যা নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত) যে অবস্থায় আছে, সেই রাষ্ট্রের এমন আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা কি ৩০০ আসন লাভ করেও সম্ভব?!

শুধুমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্রে অগ্রসরমান হয়ে -মাওলানার বক্তব্য মোতাবেক- রাষ্ট্রযন্ত্রের আমূল পরিবর্তন যে অসম্ভব তা সাধারণ মানের রাজনীতি-সচেতন ও শিক্ষিত লোকেরও বোঝার কথা। তাই শরিয়াহ তো বটেই, নিজ বোধবুদ্ধির সাথে প্রতারণা না করে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সেক্যুলার রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবী করা আসলে অসম্ভব। আল্লাহই ভালো জানেন।

এছাড়াও অনেক গণতান্ত্রিক তাত্ত্বিকদের পক্ষ বলা হয়ে থাকে"গণতন্ত্র শুরা ব্যাবস্থার অস্থায়ী বিকল্প হতে পারে।"

এটি একটি প্রচলিত কথা। একটি জনপ্রিয়, নিস্ক্রিয়তামুখী ওজর। এবং অজ্ঞতাপ্রসূত, কাল্পনিক বক্তব্য।

এমন বক্তব্যের সাধারণ কারণ হিসেবে বলা হয়,

"মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগণের নির্বাচিত নের্তৃস্থানীয় প্রতিনিধিরা সংসদে জমা হয় এবং পরামর্শ ও আলোচনা সাপেক্ষে অধ্যাদেশ ও আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করে- তাই একে 'শুরা'র মতই বলা যায়।"

প্রথমত, গণতন্ত্র বলতে মূলত বোঝানো হয় সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে। এটি এমন এক ব্যবস্থা, যা একটি সুনির্দিষ্ট শাসনকাঠামোকে ধরে রাখে। আর সেই শাসনকাঠামোটি হচ্ছে, সেক্যুলার রাষ্ট্র। সেক্যুলারিজমের ভিত্তির উপর রচিত সংবিধানকে কেন্দ্রে রেখেই সংসদ আবর্তিত হয়। পপুলিস্ট, ডানপন্থী বা ইসলামপন্থীরা যদিও নিজেদের সেক্যুলার দাবী করে না, তথাপি রাষ্ট্রীয়ক্ষমতায় তারা এই কাঠামোর বাইরে যেতে সক্ষম না। সংসদে আসলেও, তারা সেক্যুলার ব্যবস্থাকেই কেবল শক্তিশালী করার কাজে নিজেদের মেধা, শ্রম ও সময় ব্যয় করেন, করবেন।

এ বাস্তবতা বিবেচনা করার পর প্রশ্ন আসে-

উপকরণ কি উদ্দেশ্য হতে পারে?

মাশোয়ারা করা হলেই কি সেটা শুরা হবে?

মাশোয়ারা যদি দীনের মাসলাহাতে না হয়ে সেক্যুলার শাসনের শক্তিশালীকরণে হয়, তাহলেও কি সেটা "শুরা" হবে?

তাহলে একই দলীলে, বিয়ের দরকার কী? যিনার মাধ্যমেই তো প্রয়োজন পূরণ ও সন্তান উৎপাদন সম্ভব।

ক্রিটিক্যালি চিন্তা করতে গিয়ে সরল চিন্তা ভুলে যাওয়াটাই কেমন যেন এখন সবচেয়ে বড় বিপদে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর কাছেই আশ্রয়। দিন শেষে ফলাফলের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত আসে, আভ্যন্তরীণ জগতের “রুহানী ঢেউ” বা অতিবিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোনো মাসলাহা ধর্তব্য হয় না।

গণতন্ত্রকে যারা কেবল সরকার পরিবর্তন প্রক্রিয়া মনে করেন, তারা এক্ষেত্রে ভুল করেন। আর যারা একথাটি জেনেশুনে বলেন, তারা হয় প্রতারণার শিকার বা প্রবঞ্চনার বাহক।

দ্বিতীয়ত, এক অর্থে কোনো রাষ্ট্রই আসলে গণতান্ত্রিক না। আর হওয়া সম্ভবও না। জনভোটে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছার পূর্ণ প্রতিফলন কখনোই এসব রাষ্ট্রে সম্ভব না।

চলমান রাষ্ট্রীয়কাঠামোর মূল অংশ ধরা যায়-

ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দলসমূহ, আমলাতন্ত্র বা সিভিল সার্ভিস (যার রয়েছে বহুমুখী স্বার্থ ও শাখাপ্রশাখা), সামরিক বাহিনী ও বিচার বিভাগ। আর এই বিশাল ও মারাত্মক প্রভাবশালী কাঠামোটির কোনো অংশই নির্বাচিত নয়, বরং নিয়োগপ্রাপ্ত।

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা বিরোধী দল চাইলেও শাসনযন্ত্রের উঠানামায় অন্যতম নিয়ন্ত্রক অংশগুলোকে উপেক্ষা করতে পারে না। বরং, অধিকাংশ পলিসি নির্ধারণে সিদ্ধান্ত হয় তাদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে সমুন্নত ও অক্ষুণ্ন রেখেই। এর অনেক উদাহরণ আমাদের নিজেদের দেশেই আছে।

'৭১ এর পর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুজিব সরকার, ব্রিটিশ উপনিবেশিক ধারায় গড়ে ওঠা নিপীড়নমূলক আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। যদিও, পাকিস্তান আমলে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচীর অন্যতম ছিল, ব্রিটিশ আদলে গড়ে ওঠা উন্নাসিক আমলাতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটানো!

'৯৬ এ প্রথম জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপিকে পুনরায় নির্বাচন দিতে বাধ্য করা হয়। এর পেছনে অন্যতম ভূমিকা রাখে 'জনতার মঞ্চ'কে কেন্দ্র করে, ডাকসাইটের আমলা নেতা, প্রাক্তন সচিব মহিউদ্দিন খান আলমগীদের নের্তৃত্বে সচিবালয়ের বড় একটি অংশের বিদ্রোহাত্মক অবস্থান!

আর অজস্র সেনা অভ্যুথানের সাক্ষী বাংলাদেশীদেরকে সেনাবাহিনীর প্রভাব ও দাপটের কথা খুব বেশি কিছু বলার নেই।

পাশাপাশি ২০১৭ তে এস কে সিনহার জুডিশিয়াল ক্যুয়ের ব্যার্থ প্রচেষ্টাও আমাদের প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছে।

কাজেই শাসনযন্ত্রের প্রধাণতম কয়েকটি নিয়ামক—আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ ও সেনাবাহিনী (যাকে একত্রে ডিপ স্টেইট বলা যায়)- জনগণের ভোটে নির্বাচিত না।

জেনে রাখা ভালো,

সহকারী সচিব থেকে নূন্যতম প্রভাবসম্পন্ন অতিরিক্ত সচিব বা সচিব হতে ৩০ বছর লেগে যায়।

সহকারী জজ বা দক্ষ আইনজীবি থেকে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হতেও ২৫-৩০ বছর লেগে যায়।

সেকেন্ড লেফট্যনেন্ট থেকে নূন্যতম প্রভাবসম্পন্ন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হতেও লাগে প্রায় এমনই

দীর্ঘদিন সেক্যুলার সরকারের অনুগত থাকা এসব কর্মকর্তাদের রাতারাতি ইসলামী সরকারের অনুগত বানানোর প্রক্রিয়া তাহলে কী হবে? এটাও জানা দরকার।

গণতন্ত্রপন্থীরা যেহেতু আকস্মিক আঘাত বা ঢালাও পদচ্যুত করার নীতিতে যেতে পারবেন না, সেক্ষেত্রে এ ময়দানে তারা আসলে কোনোদিনও সফল হতে পারবেন না।

যারা যুগের পর যুগ সেক্যুলার আইনকানুনের মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত বেতন-ভাতা আর ওয়ারেন্ট অফ প্রিসেডেন্সির আলোকে অধীনস্তদের চাটুকারিতা আর বিলাস-ব্যাসন উপভোগ করতে অভ্যস্ত, তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে শুধু শুধু সংসদে অধ্যাদেশ আর আইন পাশ করে কিভাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব?

তুরস্ক যেখানে সামরিক অভ্যুথানের অজুহাতে ৩০,০০০ সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী পদচ্যুত করেও শরিয়া বাস্তবায়নের ধারেকাছেও যেতে সক্ষম হলো না, সেখানে এ দেশীয়দের ভবিষ্যৎ কী, তা সহজেই অনুমেয়। জামাতে ইসলামী এই ডিপ স্টেইটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের কিছু চেষ্টা করেছে এবং ব্যর্থ হয়েছে। অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে, তাদের হতভাগ্যজনক ফলাফলের ব্যাপারে।

সামান্য কিছু ব্যাক্তির স্বার্থ আর মতের কাছে কুক্ষিগত এই শাসনব্যাবস্থাকে বাহ্যত গণতন্ত্র বলা হলেও, এটি বাস্তবে অলিগার্কি বা অভিজাততন্ত্র। যারা বলেন, ভোটের মাধ্যমে সংসদে গেলে পরিবর্তন সম্ভব, তারাও অগণতান্ত্রিক দেনদরবারের মাধ্যমে সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রে প্রভাব বিস্তার না করে ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হবেন না।

তাই, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে "শুরা" সাব্যস্ত করা বুদ্ধিজীবী ও বিশ্লেষকদের প্রতি নিবেদন হল, শরঈ পর্যালোচনা, সমালোচনা যদি আপনাদের কাচে অতিসরল, গৎবাঁধা ও 'ক্রিটিক্যালি থিংকিং'মুক্ত মনে হয়; তাহলে অন্তত বাস্তবতার আলোকে হলেও গণতন্ত্রে সাথে তুলনা করে "শুরা" নামক ইসলামী পরিভাষাকে বিকৃত করা থেকে আপনাদের বিরত থাকা দরকার।

মোটকথা, সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ জাতীয় সংসদের ৩৩০টি আসনের সবকটিও যদি ইসলামপন্থীরা অর্জন করে, তবু এভাবে আমাদের রাষ্ট্রব্যাবস্থার ইসলামীকরণ কখনই সম্ভব না।

যেহেতু সেক্যুলার ডিসিপ্লিনের আলোচনা গনতান্ত্রিক ইসলামপন্থীরা বিশেষ গুরুত্ব দেন, তাই মাওলানা ভাসানির হক কথা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি-

"প্রতিটি রাষ্ট্র বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে সাবেক রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তি ও মূল্যবোধ দিয়ে নতুন রাষ্ট্রের পত্তন করা। অতীতের

আইন-কানুন, অর্ডিন্যান্স, অর্ডার সবকিছু বর্জন করে সম্পূর্ণ বিপ্লবী রীতিতে নতুন ভিত্তি রচনাই হোল বিপ্লবী সরকারের করণীয়।"

(হক কথা, ১৭ই মার্চ, ১৯৭২)

অতএব, বাংলাদেশে ইসলাম বা বিপ্লব কোনোটাই যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্ভব না- তা শরঈ, বাস্তব ও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত।

?????? ????????????

যেসব ব্যক্তিরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলামের কল্যাণ নিশ্চিতের চেষ্টা করেন তাদের মাঝে কর্মী পর্যায়ের অধিকাংশ তো বটেই, নেতৃস্থানীয়দের অনেকেও সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সক্রিয় অংশ না নেয়ার দরুণ সাংবিধানিক গণতন্ত্রের বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে, লোকমুখে প্রচলিত বয়ান কিংবা পূর্বে থেকে চলে আসা গৎবাঁধা মাসআলা আওড়ে যাওয়াই এশ্রেণীটির সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

আবার অনেকেই সংসদীয় ব্যবস্থাকে কাছ থেকে দেখেছেন এবং নিজেদের চিন্তার অসারতা বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু বিপুল সংখ্যক অনুসারী ও দীর্ঘদিনের মেহনতের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় মানসিকতার অভাবে গণতন্ত্রের পথ ত্যাগ করছেন না। অনেকে আবার লোভের বশবর্তী হয়ে বা বহুদিনের অর্জন ধরে রাখার আশায় সঠিক পথে ফিরে আসতে চাচ্ছেন না।

তবে পথ-মত-দল নির্বিশেষে এই তিন শ্রেণীর নেতা ও অনুসারীদের সকলেই নিজেদের গণতান্ত্রিক মানহাজের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে বলে থাকেন,

“সংসদ গণতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের কেন্দ্র। সংসদে গেলে, ইসলামের পক্ষে দাবি আদায় সহজ হবে। এতে করে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব রেখে ইসলামের ব্যাপক উন্নতি করা সম্ভব হবে।”

সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে সম্মানিত উলামায়ে কেরাম ও নেতাগণ এ কথা বলতে পারতেন না। বাস্তবতা ঠিক এর বিপরীত।

সংসদের শক্তিশালী বিরোধীপক্ষ ও বিপরীতমুখী যুক্তিতর্ক চালু থাকা সেক্যুলার রাষ্ট্রে কার্যকর গণতন্ত্র বা Functional Democracy এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। বাংলাদেশের পরিচিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আবুল মনসুর আহমদের বক্তব্য লক্ষ্য করুন,

> “আমি আওয়ামী-নেতৃত্বকে পরামর্শ দিয়াছিলাম, বিরোধী পক্ষের অন্তত জনপঞ্চাশেক নেতৃস্থানীয় প্রার্থীকে নির্বাচনে জয়লাভ করিতে দেওয়া উচিত। তাতে পার্লামেন্টে একটি সুবিবেচক গণতন্ত্রমনা গঠনমুখী অপজিশন দল গড়িয়া উঠিবে। আমার পরামর্শে কেউ কান দিলেন না।
>
> বিরোধী দলসমূহের ওই নিশ্চিত বিজয় সম্ভাবনার উল্লাসের মধ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষে অমন উদার হওয়াটা বোধহয় সম্ভবও ছিল না। রেডিও-টেলিভিশনে অপজিশন নেতাদের বক্তৃতা দূরের কথা, যানবাহনের অভাবে তারা ঠিকমতো প্রচার চালাইতেও পারিলেন না।
>
> পক্ষান্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব হেলিকপ্টারে দেশময় ঘূর্ণিঝড় ট্যুর করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীরাও সরকারি যানবাহনের সুবিধা নিলেন।.... তিন শ পনেরো সদস্যের পার্লামেন্টে জনা-পঁচিশেক অপজিশন মেম্বর থাকিলে সরকারি দলের কোনোই অসুবিধা হইত না।
>
> বরঞ্চ ওই সব অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান অপজিশনে থাকিলে পার্লামেন্টের সৌষ্ঠব ও সজীবতা বৃদ্ধি পাইত। তাদের বক্তৃতা বাগ্মিতায় পার্লামেন্ট প্রাণবন্ত, দর্শনীয় ও উপভোগ্য হইত। সরকারি দলও তাতে উপকৃত হইতেন।

তাঁদের গঠনমূলক সমালোচনার জবাবে বক্তৃতা দিতে গিয়া সরকারি দলের মেম্বাররা নিজেরা ভালো ভালো দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হইয়া উঠিতেন।

বাংলাদেশের পার্লামেন্ট পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের একটা ট্রেনিং কলেজ হইয়া উঠিত। আর এসব শুভ পরিণামের সমস্ত প্রশংসা পাইতেন শেখ মুজিব। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য এই যে শেখ মুজিব এই উদারতার পথে না গিয়া উল্টা পথ ধরিলেন। এইসব প্রবীণ ও দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ানকে পার্লামেন্টে ঢুকিতে না দিবার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করিলেন।"

মহিউদ্দিন আহমদ এ বক্তব্যের ব্যাপারে বলেন,

"আবুল মনসুর আহমদের এই পর্যালোচনা ছিল খুবই প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ। এরকম একপেশে পার্লামেন্ট অকার্যকর হতে খুব বেশি দিন সময় নেয়নি। নতুন রাষ্ট্রের শুরুতেই গণতন্ত্রায়ণের প্রক্রিয়া হোঁচট খায়।"

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের অভিজ্ঞতা ও মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। আহমদ ছফার সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি বলেছিলেন:

"সেভেন্টি টুতে একবার ইউনিভার্সিটির কাজে তার লগে দেখা করতে গেছিলাম। শেখ সাহেব জীবনে অনেক মানুষের লগে মিশছেন ত আদব লেহাজ আছিল খুব ভালা। অনেক খাতির করলেন।

কথায় কথায় আমি জিগাইলাম, আপনের হাতে ত অখন দেশ চালাইবার ভার, আপনে অপজিশনের কী করবেন। অপজিশন ছাড়া দেশ চালাইবেন কেমনে?

জওহরলাল নেহরু ক্ষমতায় বইস্যাই জয়প্রকাশ নারায়ণরে কইলেন, তোমরা অপজিশন পার্টি গইড়া তোলো।

শেখ সাহেব বললেন, আগামী ইলেকশানে অপজিশান পার্টিগুলা ম্যাক্সিমাম পাঁচটার বেশি সিট পাইব না। আমি একটু আহত অইলাম, কইলাম, আপনে অপজিশনরে একশো সিট ছাইড়া দেবেন?

শেখ সাহেব হাসলেন। আমি চইল্যা আইলাম ।

ইতিহাস শেখ সাহেবরে স্টেটসম্যান অইবার একটা সুযোগ দিছিল। তিনি এইডা কামে লাগাইবার পারলেন না।"

আল্লাহর শরীয়াহ মানুষের আকলের আওতাধীন না। কেবল যুক্তির মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার কল্যাণকর, মহাপ্রজ্ঞাময় বিধান বোধগম্য করানোও সংগত না। বিশেষ করে, সংসদে বসে থাকা খাহেশাতের দাসদের জন্যে! আর না সেক্যুলার শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট, বিভ্রান্ত জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ব্যাপকভাবে আল্লাহর শরীয়াহর অনুগামী হয়, হবে।

তাহলে, সেক্যুলারিজমের সুপারস্ট্রাকচারের উপর দাঁড়িয়ে থাকা, প্রবৃত্তির গোলাম অধ্যুষিত সংসদে কেবলমাত্র যুক্তিতর্কের মাধ্যমে শারঈ আইন বা অধ্যাদেশ পাস করানো কি কখনো সম্ভব? বরং এধরণের যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের মাধ্যমে সেক্যুলার সাংসদদের ইসলামবিরোধী চিন্তাধারা, চক্রান্ত ও অপচেষ্টা কি আরো সুদূরপ্রসারী ও শানিত হবে না?

তবে কি ইসলামপন্থীরা ইসলামের শত্রুদেরকে স্টেইটসম্যান হওয়ায় ভূমিকা রেখে আসছে? ইসলামের বিরুদ্ধে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতারণার নানামুখী কায়দা শিখিয়ে আসছে?

সুতরাং, ইসলামপন্থীদের জন্য সংসদে গিয়ে নিজেদের যুক্তিতর্ক তুলে ধরা, প্রকারান্তরে সেক্যুলার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালীই করে, দুর্বল নয়!

তাই গণতান্ত্রিক মুহতারামদের বোঝা দরকার, কান্ডে কুঠারাঘাত করা অবস্থায় গাছের উপর পানি যতই দেয়া হোক, সেটা সফলতা

অর্জনের উপায় হতে পারেনা।

উপলব্ধি করা প্রয়োজন, শরীয়াহ ও আকলের দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে, উপকারী নির্বোধের (Useful Idiot) মতো ইসলামের নামে ইসলামের শত্রুদের সেবাদাস হয়ে থাকার অপমান নিয়েই তাদের চলতে থাকবে। সমালোচকদের দালাল, আবেগী, অদূরদর্শী বা অন্য কোন ট্যাগ দিয়েও বিশেষ ফায়দা হাসিল হবে না।

উলামায়ে কেরাম, দাঈ ও চিন্তাবিদদের জন্য আহবান থাকবে, সামর্থ্যের সংকট ও পরিস্থিতির দাবিতে সংঘর্ষ এড়ানোর প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকতে চাইলেও, তারা যেন কেবল অগণতান্ত্রিক কমসূচীই (যেমন, দাওয়াহ, তালিম, তাদরিস, অসহযোগিতা, মানববন্ধন, অবরোধ ইত্যাদি) গ্রহণ করেন। কেননা, শারঈ ও ঐতিহাসিক দিক তো বটেই, আকল ও বাস্তব ফলাফলের মাপকাঠিতেও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেয়ে, এসকল কর্মসূচী দাবি আদায় ও কল্যাণ হাসিলে অধিক ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শামিল হয়ে, আমরা যেন শত্রুদের আনন্দিত এবং ইসলামের ক্ষতি না করি!

???????? ?? ????????? ??????? ?????? ?

গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবিগণ রাজতন্ত্র অপেক্ষা গণতন্ত্রকে উত্তম সাব্যস্ত করে থাকেন। রাজতন্ত্র নয়, বরং গণতন্ত্রের সাথেই উনারা খিলাফত ও ইসলামি ইমারতের অধিক সামঞ্জস্য খুঁজে পান। মাওলানা মওদুদি ও উনার পরবর্তী প্রজন্মের ইউসুফ আল কারদাবি, রশিদ ঘানুশি, গোলাম আজম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এ চিন্তাধারাকে আরো শক্তিশালী করেছেন। রাজতন্ত্রের তুলনায় গণতন্ত্রেই উনারা সাম্য ও সুবিচার খুঁজে পান বেশী।

উনাদের মতে, এই প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত শাসক জবাবদিহিতা ও মেয়াদ শেষে ক্ষমতা হারানোর আশংকায় ন্যায়পরায়ণতার আশ্রয় নিতে কিছুটা হলেও বাধ্য হয়।

প্রশ্ন হল, মেয়াদের শেষ প্রান্তে ক্ষমতা নবায়নের উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রতিপক্ষ ও তার সমর্থকগোষ্ঠীকে দমন-পীড়ন ও প্রতারণার যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা হয়, তা কি রাজতন্ত্রে সম্ভব?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময় পর শাসন হারানোর আশংকায়, শাসক ছলচাতুরী ও বলপ্রয়োগে আগ্রহী হয়ে ওঠে কি না? (যা রাজতন্ত্রে কদাচিৎ দেখা যায়, অথচ গণতন্ত্রে ৪/৫ বছর পর পর দেখা যায়)?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক নেতা বা দলের অবস্থান সুসংহত করার জন্য, জাতির বৃহত্তর অংশকে রাজনৈতিক নোংরামিতে লিপ্ত করা আবশ্যক হয়ে ওঠে, এট কি রাজতন্ত্রে দেখা যায়?

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অধীনে জনমতবিরোধী কিন্তু কল্যাণকর কোনো পলিসি পাস করা তাৎক্ষনিকভাবে সম্ভব হয় কি? অথচ রাজতন্ত্রে চাইলে তা খুবই সহজ ও স্বাভাবিক।

জনচাহিদার লেজুড়বৃত্তির ফলে আদর্শের সাথে আপোষকামীতার যে সহজাত প্রবণতা গণতান্ত্রিক শাসকের মাঝে ব্যাপকভাবে তৈরী হয়, রাজতান্ত্রিক শাসকের ক্ষেত্রে তা হয় কি?

রাজতন্ত্রের অধীনে মুসলিম বা মানবজাতি যে মানের জ্ঞানী ও মেধাবী ব্যক্তির উত্থান দেখেছে, গণতন্ত্রের অধীনে তার সামান্যতমও দেখা যায় কি?

চোখ বন্ধ করে ইতিহাসের আলোকে সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, গণতান্ত্রিক শাসনের তুলনায় রাজতান্ত্রিক শাসনের অধীনে মানবজাতি সবসময়ই উত্তম অবস্থায় ছিল।

মসৃণ পথের আরামপ্রিয় অভিযাত্রীগণ বুঝতে অক্ষম যে, হরতাল, ধর্মঘট বা অনশনের মতো গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর তুলনায়, অনেক দ্রুত ও কার্যকর প্রক্রিয়ায় রাজতান্ত্রিক শাসনের পলিসি পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। এমনকি জালেম, জনবিরোধী শাসনকাঠামোর পরিবর্তনের প্রশ্নেও জনগণের কাছে তুলনামূলক সহজ উত্তর ধরা দেয় রাজতন্ত্রের ক্ষেত্রেই, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, রাজতান্ত্রিক সমাজে পলিসির পরিবর্তন অনেক কম রক্তপাত ও পরিশ্রমে অর্জন হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে বহু জীবনদানের পর।

উদাহরণত, গণতন্ত্রের সূতিকাগার আমেরিকায় বর্ণপ্রথার মতো মারাত্মক মানবতাবিরোধী আইন গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিকভাবে উচ্ছেদ সম্ভব হয়নি দীর্ঘমেয়াদী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ব্যতীত। এরচেয়ে অনেক কম আত্মত্যাগের বিনিময়ে রাজতান্ত্রিক শাসনের অধীনে, তুলনামূলক আরো বড় পরিবর্তন ফ্রান্স, ব্রিটেন বা প্রুশিয়াতে ঘটানোর ইতিহাস রয়েছে।

তাছাড়া, ইসলামি বিশ্বের ইতিহাস তো সাক্ষ্যই দিচ্ছে, রাজতান্ত্রিক শাসনের অধীনে তারা পলিসি বা শাসক পরিবর্তন করতে যতটা সক্ষম ছিল, গণতান্ত্রিক শাসনের অধীনে তার সিকিভাগও করতে সক্ষম হয়নি।

মার্কিন রাজনৈতিক বিশ্লেষক কার্টিস ইয়ারভিন লিখেন,

> “সরকারের ধরণ মূলত ৩টি:
>
> রাজতন্ত্র (একজনের শাসন), অভিজাততন্ত্র (অল্প কিছু মানুষের শাসন) আর গণতন্ত্র (অনেকের শাসন) ।
>
> রাজতন্ত্র ভালো, কারণ তা অভিজাততন্ত্রের চেয়ে উত্তম। গণতন্ত্র ভালো-খারাপ কোনটাই না—গণতন্ত্র স্রেফ অসম্ভব। বিশেষ করে আজকের ভোটারদের জন্য। সমস্যা শুধু এটা না যে, আজকালকার ভোটারদের সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার বুদ্ধি নেই। বরং ব্যাপারটা আরও গুরুতর। এখনকার ভোটারদের সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো ক্ষমতাও নেই। তাদের, কিংবা তারা যে রাজনীতিবিদদের নির্বাচিত করে, বেশ অনেক দশক ধরেই বলার মতো কোন তাদের হাতে ক্ষমতা নেই।
>
> রাজতন্ত্রের তুলনায় গণতন্ত্রের অধীনে শাসক জবাবদিহিতা ও চাপের কারণে অধিক ন্যায়পরায়ণ হতে বাধ্য হয়—এমন বক্তব্য সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছুই না।
>
> রাজতন্ত্রের আরেকটি সমালোচনা হল, রাজতান্ত্রিক শাসনে উত্তরাধিকারসূত্রে শাসনক্ষমতা বন্টন হয়। ফলে যোগ্য ব্যক্তি দায়িত্বপালন থেকে বঞ্চিত হয়। অবশ্যই এমনটা ইসলামি ইমারাহর মূলনীতির খেলাফ, সন্দেহ নেই। কিন্তু একই সমস্যা তো আরো তীব্রভাবে গণতন্ত্রেও রয়েছে।”

শায়খ আবু কাতাদা আল ফিলিস্তিনি বলেন,

> “যখন কোনো দলের মূল কাজ হয়ে যায় তাদের লোকদেরকে পার্লামেন্ট পৌঁছানো, তখন এই জামাতে অগ্রগামী কারা হয়? এক্ষেত্রে দলগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করে আত্মীয়-স্বজন ও বংশীয় লোকদের ভোট অর্জন করতে। তখন জামাতসমূহ অনেক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলীর ব্যাপারে ছাড় দিয়ে এমন লোকের খোঁজ করে, যাকে তার বংশের (বা এলাকার লোকজন) ভোট দিবে। তখন অগ্রগামী হবে স্বজনপ্রিয় লোক।
>
> এছাড়াও, নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রয়োজন পড়বে অনেক অর্থের। তখন সে অধিক সম্পদের অধিকারী লোককে প্রাধান্য দিবে। ন্যায়পরায়ণতার অনেক বৈশিষ্টাবলির ব্যাপারে ছাড় দিবে, যাতে তার আর্থিক সামর্থ্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এই অবৈধ অনুপ্রবেশ সুযোগ অনেক নেতৃত্বলোভী, সুবিধালোভী, স্বার্থবাদী ও দালালদের জন্য নেতৃত্বে পৌছার পথ সহজ ও সুগম করে দিবে। আর এটা হয়েছেও।

> অনেক ইসলামি সংগঠন, দল ও জামাআতের এই অবস্থা। এমনকি ইসলামি কেন্দ্রগুলোর দায়িত্বশীলদের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি দেই, তবে তাদেরকেও উক্ত অবস্থায়ই দেখতে পাব।”

তাই, রাজতন্ত্রের সমালোচনা করে গণতন্ত্রের বৈধতা আদায়ের দুষ্টচক্রে ফেলে মানুষকে বোকা বানানোর পরিবর্তে, গণতন্ত্র এখন পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলিমদের কতটুকু ক্ষতিগ্রস্থ বা লাভবান করলো—সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

For The Sake of Argument: □□□□□□□ □□□□!

ইসলাম ও মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়ার সম্মান ফিরিয়ে আনতে সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই শরীয়াহ শাসন ফিরিয়ে আনার অপরিহার্যতার ব্যাপারে একমত। ইসলামি শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া ব্যক্তি পর্যায়েও স্বাধীনতা ও সম্মানের সাথে ইসলামি মূল্যবোধের পরিপূর্ণ প্রতিবিধান সম্ভব নয়, এটি স্পষ্ট। মুসলিম উম্মাহর সচেতন কোনো অংশই এক্ষেত্রে মতানৈক্য করেনি। আকিদা সহিহকরণ বা নফসের পরিশুদ্ধির মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামি শাসন ফিরে আসবে, এমন স্থবির চিন্তার অনুগামী শ্রেণীর কথা অবশ্য আলাদা।

কিন্তু, আফসোসের বিষয় হল, ইসলামের কর্তৃত্বের জন্য অপেক্ষমান উম্মতের বড় একটি অংশ, যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মশগুল—তারা প্রায়ই চকচকে যে কোনো কিছু দেখলেই, তাকে স্বর্ণ সাব্যস্ত করতে তৎপর হয়।

তাই তাদের আশা-ভরসা এরদোগান, ইমরান খান, মুহাম্মাদ বিন সালমান, বিন জায়েদ প্রমুখ সেক্যুলার শাসকদের কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে; ঠিক যেমন, আগের প্রজন্মগুলো ঘুরেছেন নাজিমুদ্দিন আরবাকান, জিন্নাহ, আব্দুল আজিজ আলে সউদ বা বাদশাহ হুসাইনকে কেন্দ্র করে। এসকল নেতাদের প্রত্যেকেই দ্বীনকে পুঁজি করে ক্ষমতা চর্চা করেছে, এমন বক্তব্য থেকে বিরত থেকেও, অন্তত এটুকু বলা যায় যে, তাদের শাসনব্যবস্থা উম্মাহর মাঝে শরীয়াহ শাসনের কল্যাণ ফিরিয়ে আনতে তো পারেই নি, বরং বিপরীতটিই করেছে।

ইতিহাস ও বাস্তবতা সাক্ষ্য দেয় যে, এসব সেক্যুলার শাসকদের প্রত্যেকেই নিজ ভূমিতে সেক্যুলার শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ইসলামের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

এখন উত্তেজিত ও উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ যুক্তি উত্থাপন করতে পারেন, অন্য শাসকরা তাদের তুলনায় আরো মন্দ হতে পারতো, কিংবা তাদের কেউ কেউ পূর্ববর্তী শাসকদের অনেক ইসলামবিরোধী কাজের সংস্কার করেছেন, ইসলাম ও মুসলিমদের পূর্বের তুলনায় স্বাধীনতা দিয়েছেন। উত্তরোত্তর তারা ইসলামের জন্য নানামুখী কল্যাণকর পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এধরণের বক্তব্যের ক্ষেত্রে এরদোগান, ইমরান খানের আলোচনা সামনে চলে আসে।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সাধারনত এর চেয়ে ভালো শাসক পাওয়া সম্ভব না, এমন চিন্তা থেকেই হয়তো ‘ইসলামি’ গণতান্ত্রিক নেতা ও দলগুলো থেকেই মূলত এজাতীয় ইসলাম-পছন্দ সেক্যুলার নেতাদের উচ্চকিত প্রশংসা পাওয়া যায়।

জনপ্রিয় এই যুক্তির বিপরীতে জটিল আলোচনার মারপ্যাঁচে না গিয়ে, তর্কের খাতিরে এরদোগান বা ইমরান খানকে অপারগ ও চেষ্টারত ‘মুসলিম শাসক’ ধরে নেয়া যাক।

তবুও বলতে হয়:

ক) ‘মন্দের ভালো’ কিংবা ‘ধারাবাহিকভাবে ইসলামের খেদমতের উন্নতি সাধনে লিপ্ত’ হওয়ার যুক্তি যথার্থ হলে, আনোয়ার সাদাতকেও উম্মাহর মহান বীর হিসেবে মেনে নিতে হয়। কেননা, মিশরে ইসলামপন্থী ও মুসলিমদের উপর জামাল আব্দুন নাসের দমন-নিপীড়নের যে লৌহখাঁচা তৈরি করেছিল, আনোয়ার সাদাতের সময় তা অনেকটাই তুলে নেয়া হয়। মুসলিমদের তুলনামূলক ধর্মীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি, ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোও প্রকাশ্যে কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ পায়।

কিন্তু ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে ইহুদিদের সাথে আঁতাতকারী, গাদ্দার আনোয়ার সাদাতকে বোধ করি কেউই উম্মাহর সুলতান আখ্যা দেয়নি, দিবেও না।

একইভাবে, '৭০ দশকব্যাপী ব্যাপক দমন-পীড়নের পর—ইসলামপন্থীদের প্রতি আটরশীর মুরিদ, বিশ্ব-বেহায়াখ্যাত প্রেসিডেন্ট লেজেহুমু এরশাদের 'মহানুভবতা'ও মোটামুটি সবার জানা। তাহলে এ বেচারার 'খেতাব' কোথায়? এরদোগান তুরস্কের, ইমরান খান পাকিস্তানের আর এরশাদ বাংলাদেশের—এটাই কি তবে এরশাদের সমস্যা!

খ) আমরা সবাই কমবেশী উমাইয়া বা আব্বাসি শাসনের ব্যাপারে জানি। নিঃসন্দেহে, চলমান সেক্যুলার শাসন বা যে কোনোপ্রকার কুফরি শাসনের পরিবর্তে উমাইয়া বা আব্বাসিদের ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসনও আমাদের নিকট অধিকতর পছন্দনীয়।

তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, উমাইয়া শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও আবদুল্লাহ ইবন জুবায়ের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে অন্যায়ভাবে হত্যার পর। এছাড়াও, এই শাসনের ভিত্তি রচনায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যুদ্ধ ছাড়াই হত্যা করে লক্ষাধিক মানুষ! মর্মান্তিকভাবে নিহত হন ইমাম সাঈদ ইবন জুবায়ের (রহ.) । এ শাসনের মাসলাহাত রক্ষার্থেই, সিন্ধুবিজয়ী মহান বীর মুহাম্মাদ ইবন কাশিম (রহ.) মৃত্যুবরণ করেন কারাগারে। নফসে যাকিয়্যাহ ও তার ভাইকেও হতে হয় নিহত। পলাতক জীবন বেছে নিতে বাধ্য হোন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ।

আবার, আব্বাসীয় শাসন প্রতিষ্ঠায় আবু মুসলিম আল-খুরাসানি হত্যা করে ছয় লক্ষাধিক মুসলিম। দামেস্কে প্রবেশের পর, আব্বাসি শাসনের প্রভাব বিস্তারে আব্দুল্লাহ ইবন আলি উমাইয়া শাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট নব্বই হাজার মুসলিমকে হত্যা করে। আবদুল্লাহ ইবন আলি উমাইয়াদের বহু লাশ কবর থেকে উঠিয়ে চাবুকপেটা করে এবং পুড়িয়ে দেয়।

উমাইয়্যা বা আব্বাসীয়দের এসকল অন্যায় সত্ত্বেও, মুসলিম উম্মাহ তাদের আনুগত্য মেনে নিয়েছিল। কেননা, তারা শাসনব্যবস্থায় শরীয়াহকে অপরিহার্য অনুষঙ্গ সাব্যস্ত করতো, জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণ করতো এবং ইসলামের শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত রাখতো। ইসলামের প্রচার-প্রসারে তাদের অনবদ্য ভূমিকার ফলে তাদের আনুগত্য ও সহায়তায় উম্মাহ ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি অন্যায় প্রকাশ পেলে, তাদের প্রকাশ্য-গোপন বিরোধিতাও জারি রেখেছে।

কিন্তু কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি কি ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার পথে উমাইয়্যা বা আব্বাসীদের অনুসরণের আহবান জানাবে? কিংবা, কোনোপ্রকার ভূমিকা-উপসংহার বাদ দিয়ে ঢালাওভাবে উমাইয়্যা শাসন বা আব্বাসী শাসন প্রতিষ্ঠার আহবান জানাবে?

অবশ্যই না।

যে কোনো আকলসম্পন্ন ও শরীয়াহর প্রাথমিক স্তরের জ্ঞান রাখা ব্যক্তিও, নবি (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদার শাসন ফিরিয়ে আনার আহবান ও প্রচেষ্টাকেই নিজের কর্তব্য জ্ঞান করবে।

কাজেই কোনো জালিম বা পাপাচারী ইসলামি শাসক চেপে বসলে, তা মেনে নেয়া এক বিষয়; আর দাওয়াত ও মেহনতের ক্ষেত্রে, জালিম বা পাপাচারীর শাসনকে মহিমান্বিত করা বা এমন শাসকের গুণগান গাওয়া আরেক বিষয়। দ্বিতীয়টি কোনোভাবেই ইসলামসম্মত হতে পারে না! আর এমন দাওয়াহ ও দাঈ এসময়ে দ্বীন ও উম্মাহর জন্য মারাত্মক ও আত্মঘাতী ফলাফল নিয়ে আসবে, এতেও সন্দেহ নেই!

যদি তর্কের খাতিরে এরদোগান বা ইমরান খানকে যুগের সুলতান মেনেও নেয়া হয়, তবুও—এমন শাসক, শাসনব্যবস্থা বা (গণতান্ত্রিকভাবে) ক্ষমতা অর্জনের প্রক্রিয়ার ভূয়সী ও উচ্ছসিত প্রশংসা করা মুলতঃ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বা আবু মুসলিম আল-খুরাসানির অনুসরণকেই উম্মাহর মাঝে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

আর নিঃসন্দেহে বাস্তবতা হচ্ছে, সিরিয়া ও সোমালিয়াতে কাফিরদের সাথে মিলে মুসলিম হত্যায় সরাসরি ভূমিকা রাখা, ইসরায়েলের

ইহুদিদের বিমান পাঠিয়ে নিরাপত্তা দেয়ার মতো যে কাজগুলো "সুলতান" এরদোগান করেছেন, তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কর্মকান্ডের চেয়েও মারাত্মক!

আর পশ্চিমাদের সন্তুষ্টকরণে ওয়াজিরিস্তান, বেলুচিস্তানে পাইকারী হারে মুসলিমনিধন কিংবা উইঘুর মুসলিম হত্যায় বৈধতা প্রদান—কোনো সন্দেহ ছাড়াই আবু মুসলিম আল-খুরাসানির কর্মকান্ডের চেয়েও মারাত্মক!

আর শেষ কথা হচ্ছে, নববি মানহাজের শাসনের পরিবর্তে হাজ্জাজি শাসনে সন্তুষ্ট, বিমুগ্ধ দাঈ ও ইসলামপন্থীদের হাতে সমর্পিত হওয়া বা তাদের অন্ধানুকরণ বিপদ ছাড়া আর কিছু বয়ে আনার সম্ভাবনা কম। এ কথা আশা করি সহজেই বোধগম্য।

তাই বিজ্ঞ ডক্টর আইমান আবু মুহাম্মাদ আল মাসরির দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ বিবেচনায় নেয়া কাম্য, যিনি বলেছেন-

> "আমরা খুলাফায়ে রাশেদার আদলে হুকুমত চাই। কারণ, খুলাফায়ে রাশেদার উপর সন্তুষ্ট থেকে রাসুল (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমরা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও আবু মুসলিম খুরাসানীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চাই না।"

[illegible] !

দেওবন্দি উলামায়ে কেরামের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নেয়ার যুক্তি হিসেবে মুফতি আবুল হাসান আব্দুল্লাহ (দা বা)'র বক্তব্য প্রাসঙ্গিকঃ-

> "আমাদের গুনাহ-অপকর্ম, দ্বীন-শরীয়তের প্রতি উদাসীনতা, সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞানের অনুপস্থিতি এবং তাদের কাছে দ্বীন পৌঁছে দেওয়া ও সহীহ মানসিকতা তৈরি করার ব্যাপারে আমাদের আলেমসমাজ ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের ব্যর্থতা আমাদেরকে এ অধঃপতনে নামিয়েছে। (অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ)
>
> যে পর্যন্ত সাধারণ লোকজনের একটি বিশাল অংশকে দ্বীনি শিক্ষা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতার সৃষ্টি না করা যাবে এবং চিন্তা ও বুদ্ধি বিকাশের মাধ্যমে গণজারণ ও বিপ্লবের সূচনা না করা যাবে সে পর্যন্ত আমাদেরকে গণতন্ত্রের এই তেতো শরবত পান করেই যেতে হবে।"

যার অর্থ হল, ইসলামি আদর্শে দীক্ষিত, যোগ্য ও পরিবর্তনে সক্ষম নেতৃত্ব ও দাওয়াতের উপস্থিতির আগ অবধি গৃহীত সাময়িক একটি কর্মসূচী হচ্ছে 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন'। ইখওয়ান বা জামায়াতে ইসলামির মতো গণতন্ত্রকে উনারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার মানহাজ মানেন না, বরং দাওয়াত ও আত্মরক্ষার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখেন।

বাস্তবতা হল, আমাদের সরলমনা উলামায়ে কেরামের গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার ফলেই বরং উপযুক্ত দাওয়াত ও নেতৃত্বের সংকট তীব্রতর হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মশগুল উলামাদের চিন্তাগত ও আদর্শিক মানের গ্রাফ ক্রমশই নিম্নগামী হতেও দেখা যাচ্ছে।

কেউ যদি দাবি করেন—উলামায়ে কেরামের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জাতীয় জীবনে ইসলামের প্রভাব বাড়ানো সম্ভব; তবে আমরা গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চায় উলামায়ে কেরামের ঐতিহাসিক পরিসংখ্যানের দিকে নজর দেয়ার মাধ্যমে বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবঃ-

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সর্বপ্রথম দেখা যায় জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর, ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে উলামা ফ্রন্টের ব্যানারে হাফেজ্জী হুজুরের (রহ.) এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মাধ্যমে। প্রকৃত বাস্তবতা যাই হোক, ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, দশ কোটি মুসলমানের দেশে তিনি (রহ.) দুই লক্ষাধিক ভোটও পাননি।

সর্বজনশ্রদ্ধেয়, সুলেখক মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ (দা বা), মাওলানা নাসিম আরফাত (দা বা) সহ আরো অনেকের লেখা পাঠ করলে অবশ্য মনে হতে পারে, সূক্ষ্ম কারচুপি ও নিকটজনদের যথাযথ আনুগত্যের অভাবে 'অল্পের' জন্য শায়খ (রহ.) রাষ্ট্রপতি হতে পারেন নি। কিন্তু বাস্তবতা হল, সরকারি রোষানলে মেরুদণ্ড ভাঙা, কমিউনিস্ট পার্টি জাসদের মেজর জলিল পর্যন্ত হাফেজ্জী হুজুর রহঃ এর কাছাকাছি ভোট পায়। উভয়ের কেউই ২% ভোটও পান নি। মনে রাখতে হবে, সেই সময়কার সরকারের কাছে জাসদ সন্দেহাতীতভাবেই হাফেজ্জী হুজুরের দলের চেয়ে অধিক চক্ষুশূল ছিল।

আরও দেখুন, ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে জামায়াত ইসলামি ৫টি আসন পেলেও মূলধারার কওমি অঙ্গনের কোনো দল একটি আসন লাভেও সক্ষম হয় নি। অথচ তখন জামায়াতে ইসলামি তাদের শীর্ষ নেতা গোলাম আজমের নাগরিকত্ব ইস্যু নিয়ে যথেষ্ট ব্যাকফুটে ছিল।

এরপর, ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ৭ টি ইসলামি দলের সমন্বয়ে গঠিত জোটের প্রার্থীদের মধ্য থেকে মাত্র একটি আসনে মাওলানা ওবায়দুল হক বিজয়ী হন। পক্ষান্তরে জামায়াতে ইসলামি ১৮টি আসনে জয়লাভ করে। যদিও তাদের প্রাপ্য ভোট জাতীয় পার্টির চেয়েও বেশী ছিল।

১৯৯৬ সালে দেওবন্দী ধারার কোন দল একটি আসনও লাভ করে নি।

২০০১ সালে ইসলামি ঐক্যজোট বিএনপিকে ক্ষমতায় আনার বাইরে কার্যত কোন কিছুই অর্জন করতে পারে নি।

ঐতিহাসিক উপাত্ত থেকে স্পষ্টতই প্রতিভাত হয় যে, গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ফলে উলামায়ে কেরামের গ্রহণযোগ্যতা বাড়েনি। বরং, সেক্যুলারদের জন্য মানুষের কাছে এটি স্পষ্ট করা সহজ হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ ইসলাম চায় না! আর উলামায়ে কেরাম জনবিচ্ছিন্ন। সবচেয়ে দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, উলামায়ে কেরামের গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চা—কখনো আমেরিকাপন্থী বিএনপি, আবার কখনো ভারতপন্থী আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনামল থেকে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসপন্থী রাজনীতির গৎবাঁধা তাকলিদ বারবার একই ফলাফলই এনে দিচ্ছে। আর তা হল প্রতারক, সুবিধাবাদী, ক্ষমতালিপ্সু ও সেক্যুলার রাজনৈতিক গোষ্ঠীর গ্রহণযোগ্যতা তৈরিতে ভূমিকা রাখা!

আমরা দেখতে পাই, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে উলামায়ে কেরামের গুরুত্বপূর্ণ অংশে আপোষকামিতা ও পরনির্ভরশীলতার মনোভাব জেঁকে বসেছে। কোনো সেক্যুলার শক্তির বিরুদ্ধে উলামায়ে কেরামের অর্জিত ইতিবাচক ফলাফলের প্রাক্কালে, দূতাবাস, আমলাতন্ত্র বা সামরিক বাহিনীর সমর্থনের সংকট দেখিয়ে উলামাদের আন্দোলনের নেতৃত্ব বারবার ছিনিয়ে নিচ্ছে অন্য কোনো সেক্যুলার প্রতিবিপ্লবী শক্তি। সংকুচিত আত্মবিশ্বাস আর ডানপন্থী-সুবিধাবাদী-সেক্যুলার শক্তির উপর নির্ভরশীল হওয়ার দ্বৈত সমস্যায় উলামায়ে কেরামের মেহনত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত।

কেন যেন মনে হয়, এমন আমাদের উলামায়ে কেরামের রাজনৈতিক নেতৃত্বদানের এমন বাস্তবতার কথাই শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) বলে গিয়েছিলেন,

> "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করে বলেছেন, "মুমিন একই গর্ত থেকে দুবার দংশিত হয় না।"
>
> কিন্তু আমাদের বাসিন্দারা দু'বার নয়, বহুবার দংশিত হয়েও যেন দংশনের ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। আবারও সহজ দংশনের শিকার হয়ে যান। তাঁদের স্মৃতিশক্তি এতোই দুর্বল যে, নেতা ও শাসকদের অতীত, এমনকি নিকট অতীতও তারা ভুলে যান। তাঁদের ধর্মীয়, সামজিক ও নাগরিক সচেতনতা মর্মান্তিকভাবে দুর্বল, আর রাজনৈতিক সচেতনতা তো বলতে গেলে একেবারেই শুন্য।
>
> এই সচেতনতার অভাবেই তারা বাইরের শক্তিগুলোর এবং নিজেদের স্বার্থবাদী নেতাঁদের হাতে 'খেলার পুতুল' হয়ে আছে। খুব সহজেই তাঁদের দৃষ্টি ও মনোযোগ যে কোনো দিকে ঘুরিয়ে দেয়া যায় এবং এক লাঠিতে

সবাইকে ইচ্ছেমত হাঁকিয়ে নেয়া যায়।”[10]

বারবার ইসলামের খেদমত করতে গিয়ে বিপরীত ফলাফল প্রত্যক্ষ করার একটি বড় কারণ হল, রাজনীতির বয়ানে ইসলামের বিজয় বা খেলাফত প্রতিষ্ঠার কথা সামনে আনলেও কার্যত তারা পরিবর্তনের জন্য “সেক্যুলারিজম” এর কাঠামোর ভেতরেই প্রবেশ করেছেন। এতে করে সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা আরো শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

আবারো বলব, সেক্যুলারদের পাতানো মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে ইসলামকে বিজয়ী করা যায় না। গায়ে আগুন জালিয়ে শীতলতাবোধ করা যেমন সম্ভব না, তেমনই গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করাও অসম্ভব!

তাই উলামায়ে কেরামের জন্য উত্তম হলো,

ক) গণতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে সরে এসে জাতিকে সঠিক দাওয়াহ ও নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে একত্রিত ও সক্রিয় করা, এবং,

খ) সামর্থ্য মোতাবেক অসহযোগিতা, প্রতিরোধ, চাপপ্রয়োগ, ইন্টিমিডেশনের মাধ্যমে সেক্যুলার শক্তির মোকাবিলা করা।

কুম্ভকর্ণের মতো দীর্ঘমেয়াদী আরামদায়ক দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকার চেয়ে, নিজেকে যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবতার সামনে দাড় করানোই অধিক লাভজনক। যদি আসলেই উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বাধীন ইসলামি দলগুলো বা হেফাযতে ইসলাম সেক্যুলার আধিপত্যের পতন বা প্রতিস্থাপনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন না করেন, তবে তা ইসলামপন্থীদের জন্য দুঃখের বোঝা কেবল ভারীই করবে।

[illegible]

ইখওয়ানুল মুসলিমিন ১৯২৮ সালে মিশরে হাসান আল বান্না (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামি আন্দোলন; যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে ও দেখিয়ে থাকে। তিউনিশিয়ার আন-নাহদা, ইয়েমেনের আল ইসলাহ, ফিলিস্তিনের হামাস, উপমহাদেশের জামায়াতে ইসলামি এই আন্দোলনের নেতা ও আলেমদের মানহাজের অনুসরণ করে। তাই ইখওয়ানের ইতিহাস মূলত আমাদের দেশের জামায়াতেরই ইতিহাস, বা ‘ইসলামি’ গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই ইতিহাস!

ইখওয়ানুল মুসলিমিন, জামাত বা আন-নাহদার মানহাজ বুঝতে “আল-মুসাওওয়ার” ম্যাগাজিনের এক সাক্ষাৎকারে দেয়া ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রধান মুরশিদের বক্তব্য দেখা যাক। উনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “আপনারা কি পশ্চিমা গণতন্ত্রের মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী?”

জবাবে তিনি বলেছিলেন,

“আমরা স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আর গণতন্ত্রই যেহেতু মানবরচিত সর্বোপযোগী ব্যবস্থা, যেখানে স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশি রক্ষা হয়, তাই এর সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই।”

তাকে আরো জিজ্ঞেস করা হয়, “ক্ষমতা গ্রহণের পর রায় প্রদানের কর্তৃত্ব কাদের হাতে থাকবে? আহলুল হাল্লি ওয়াল ‘আক্বদের (সুনির্দিষ্ট ইসলামি উলামা, নেতৃত্ববৃন্দ) হাতে থাকবে, নাকি সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচিত সাংসদদের হাতে?”

জবাবে তিনি বলেন,

> “ক্ষমতা দখলের আলাদা কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই। তবে জনগণ আমাদেরকে নির্বাচিত করলে, আমরা সেটা প্রত্যাখ্যান করি না। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বর্তমান সময়ে জনগণের অভিব্যক্তির যথোচিত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে সংসদীয় পদ্ধতিই সর্বাধিক উপযুক্ত মাধ্যম।”

ইসলামের মৌলিক অবস্থানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে ইসলামপন্থীরা ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হবে, লিবারেল পশ্চিমা বিশ্ব কখনোই এটা মেনে নেয়নি ও নেবে না। এই সহজ বাস্তবতাকে বুঝতে ইখওয়ান, জামাত ও সমমনারা ব্যর্থ হয়েছে। এ মানহাজ অনুসরণ করে ক্ষমতার আসন গ্রহণ করার জন্য বেছে নিতে হবে—অন্তঃসারশূন্য, ধর্মনিরপেক্ষ, বেহাত, বিকলাঙ্গ এক বিকৃত পন্থা।

ইখওয়ানি গণতন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে ওপরের যথার্থতা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। ইতিহাস, ইখওয়ানের এ সমস্ত ব্যর্থ গণতান্ত্রিক উদাহরণে ভরপুর। সত্যান্বেষী ব্যক্তিরা সাম্প্রতিক ইতিহাসের অল্প কিছু পাতা উল্টালেই হতবাক হয়ে এ জাতীয় ব্যর্থ গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাবেন।

বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি। এসব ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা সে সমস্ত লোকদের, যাদেরকে বলা হয় গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থী অথবা মধ্যমপন্থী।

????? ??????? ????????

ইসলামপন্থীদের জন্য যে গণতন্ত্র কার্যকরী নয়, আলজেরীয় অভিজ্ঞতা তার সর্বাধিক সুস্পষ্ট উদাহরণ। আলজেরিয়ার ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট নামের দলটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইখওয়ানের নীতিমালা গ্রহণ করেছিল। রাজনৈতিক যুদ্ধ হিসেবে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছিল পার্লামেন্টে প্রবেশ করে ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে। দলটি তাদের প্রথম নির্বাচনে বিজয় অর্জন করেছিল। অতঃপর ক্ষমতা গ্রহণের দিকে কিছুদূর এগোতেই পশ্চিমা বিশ্বের সমর্থনে সেনা অভ্যুত্থান ঘটে । নির্বাচনের ফলাফল বাতিল হয়ে যায়। দলের প্রতীক বাজেয়াপ্ত করা হয়। নেতা-কর্মীদেরকে আটক করে নির্বাসিত করা হয় মরুভূমিতে।

তাদের অপরাধ হলো, নির্বাচনে কেন তারা বিজয় অর্জন করল? আর এভাবেই জেল-জুলুমের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রহসন সমাপ্ত হয়, আর নতুন করে সামরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে।

???????? ???????? ??????????

হারাকাতুল মুকাওয়ামা আল-ইসলামিয়া বা হামাস ফিলিস্তিনের বিধানসভা নির্বাচনে বিশাল বিজয় অর্জন করেছিল। কিন্তু তারপর কী হয়েছে?

সারাবিশ্ব দ্রুত ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর অন্যায় অবরোধ আরোপ করেছে! এই অবরোধ আরোপের উদ্দেশ্য ছিল, জনগণকে দুর্বল করে দেয়া এবং ইহুদিদের জবরদখলকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে হামাসের রাজনৈতিক স্বীকৃতি কেড়ে নেয়া। সেই তখন থেকে আজও পর্যন্ত গণতান্ত্রিক এই সমস্ত প্রহসনের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

?????? ???????? ??????????

আশির দশকের শেষের দিকে প্রাথমিক নির্বাচনগুলোতে ‘হিযব আন নাহদ্বা আল-ইখওয়ানি’ বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করেছিল। আর এই বিজয়ের মাধ্যমেই ইসলামি এই সংগঠনের পতনের সূচনা হয়। দলটি ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং নেতা-কর্মীদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। জনগণের পক্ষ থেকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে স্বদেশ থেকে উৎখাত করে প্রবাসে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে “হিযবুন নাহদ্বা আল-ইখওয়ানি” নেতৃবৃন্দের সে সময় প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় তাগুত প্রেসিডেন্ট যাইনুল আবেদীন ইবনে আলীর রোষানল থেকে আত্মরক্ষা করা।

এছাড়াও, আরব বসন্তের পর ক্ষমতা চর্চার কিছুদিন পার না হতেই সেক্যুলার প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতাচ্যুত হয় আন-নাহদা।

রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামপন্থীদেরকে আরো কোণঠাসা করা হয়।

চতুর্থ উদাহরণঃ তুরস্ক

ইসলামপন্থীরা ক্ষমতায় যাবে তুর্কির জাহেলী মনোভাবাপন্ন লোকেরা কোনো অবস্থাতেই এটা মেনে নেয়নি। পূর্ব অভিজ্ঞতা ও ঘটনাপ্রবাহ একাধিকবার এটা প্রমাণ করেছে। তবে এক শর্তে তারা এটা মানতে রাজি ছিল, ইসলামপন্থীদের দ্বীন থেকে পুরোপুরি সরে আসতে হবে। যদি তা না করা যায়, তবে ইসলামপন্থীদের পরিণতি হচ্ছে: কারাবরণ করা, বিতাড়িত ও দেশান্তরিত হওয়া, বিচারের মুখোমুখি হওয়া এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া।

নাজমুদ্দিন আরবাকান নেতৃত্বাধীন সালামা পার্টি (MSP) কয়েক দশক আগে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ লাভ করে। আরবাকান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। ইহুদি ভাবাপন্ন সামরিক বাহিনী ইসলামি আন্দোলনের এই জাগরণের মুখে সেনা-অভ্যুত্থান ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় খুঁজে পেল না। তাই তারা গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে দেশে স্বৈরশাসন ফিরিয়ে আনে।

সেনা অভ্যুত্থানের পর কয়েক বছর না যেতেই সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক প্রহসন শুরু করে দেয়। সালামা পার্টি ফজিলত পার্টি নাম ধারণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করে সেনা নিয়ন্ত্রিত কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। আঙ্কারার সিংহাসন টিকিয়ে রাখার জন্য অযৌক্তিক বহু ছাড় দেয়া সত্ত্বেও নব্য জাহিলিয়াত-প্রিয় তুর্কিদের মনোরঞ্জন করতে তারা সক্ষম হয়নি।

সঙ্গত কারণেই রাজনৈতিক ক্যানভাসে নতুন চিত্র আসে। নাজমুদ্দিন আরবাকানসহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বিচারের মুখোমুখি হন। ইসলামি দলটি ভেঙে দেয়া হয় এবং নাজমুদ্দিন আরবাকান ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি রাজনীতি থেকেই নিষিদ্ধ হন। গণতন্ত্র-প্রেমিকদের অভ্যাস অনুযায়ী তুরস্কের ইসলামপন্থীরা দ্বিতীয়বার রাজনীতিতে আসার প্রচেষ্টা চালান। এবার “ওয়েলফেয়ার পার্টি” (কল্যাণ সংগঠন) নামে তারা দল ঘোষণা করেন। অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে এ দল পরাজয় বরণ করে এবং অল্প সময়ের ভেতর তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত রজব তাইয়্যেব এরদোগান নতুন দল গঠন করেন, যার নাম দেন Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)। ইসলামবান্ধব ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে তিনি দলটি প্রতিষ্ঠা করেন! দলটি পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সরকার গঠন করে। তবে সেই ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর ইসলামের লেবাস চড়ানো হয়। সবমিলিয়ে উদ্দেশ্য হল, লিবারেল পশ্চিমা বিশ্বের মর্জি যেন রক্ষা হয়। পাশাপাশি তুরস্ক রাষ্ট্রের মূল নিয়ন্ত্রক যায়োনিস্ট সেনাবাহিনীকে তোয়াজ করে চলা যায়।

ক্রোয়েশিয়া সফরকালে তুরস্ককে সকলপ্রকার দ্বীন থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখার নিশ্চয়তা দিয়ে এরদোগান বলেন,

> “এ ব্যাপারে আমার অবস্থান সকলেই জানেন। বাস্তবতা হচ্ছে রাষ্ট্রের উচিৎ সকল ধর্ম থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখা।”

এছাড়াও, ইসরায়েলের সাথে এরদোগানের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ন্যাক্কারজনক ঘটনাও, সচেতন সকলেরই জানা রয়েছে।

পঞ্চম উদাহরণঃ ইয়েমেন

প্রকৃতপক্ষে ইয়েমেনে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পরিণতি হৃদয়দগ্ধ করা মর্মান্তিক এক অভিজ্ঞতা। আব্দুল মাজিদ আল-জিনদানির নেতৃত্বে ইখওয়ান (ইয়েমেন ‘আল ইসলাহ’ নামে পরিচিত) ক্ষমতা গ্রহণের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই এই জামাত ইতিহাস হয়ে যায়।

সেক্যুলার, আমেরিকান দাস আলী আব্দুল্লাহ সালেহকে নিঃশেষ করার জন্য দশ লক্ষ সশস্ত্র ইয়েমেনি প্রেসিডেন্ট ভবন ঘেরাও

করেছিল। কিন্তু আব্দুল মাজিদ আল-জিনদানির “হেকমতের” কারণে সেই উদ্যোগ সফল হয়নি। প্রকারান্তরে, তিনি ইয়েমেনের এই তাগুতকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন মুসলিমদের ঘাড়ে চেপে বসার জন্য।

আব্দুল মাজিদ আল-জিনদানির হেকমত, দশ লক্ষ সদস্যের সেই দলটি ভেঙ্গে দিল যাদের দাবি ছিল, (ইসলামি) শরীয়তই হবে আইন প্রণয়নের প্রধান উৎস। এরপর সরকার গঠন হলো।

জিনদানি সেদেশের উপপ্রধান হয়ে গেলেন। আর এদিকে আলী আব্দুল্লাহ সালেহ ষড়যন্ত্র করে সালেম আলবাইদ্ব-এর নেতৃত্বে পরিচালিত দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্কট মোকাবেলায় ইখওয়ানকে ব্যবহার করতে লাগল। দক্ষিণাঞ্চলের নেতৃবৃন্দকে পার্লামেন্টে রাজনৈতিকভাবে বয়কট করা হলো। আলবাইদ্ব ও তার অনুচরেরা ওই অবস্থায় উত্তরাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখলনা।

যুদ্ধ শুরু হলো। সেই যুদ্ধে ইখওয়ানের যুবকেরা ত্যাগের বিরাট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। যুদ্ধে অল্প সময়ের ভেতর দক্ষিণাঞ্চল পরাজিত হল। উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে তা পুনরায় যুক্ত হলো। দ্বিতীয়বার নির্বাচন দেয়া হলো। তখন বিভিন্ন সেবামূলক মন্ত্রণালয়ের দায়-দায়িত্ব ইখওয়ানের লোকদের কাঁধে অর্পণ করা হলো। এদিকে তাদের মন্ত্রণালয়ের কাজে অর্থ খরচ করতে বাধা দেয়া হলো। উদ্দেশ্য ছিল, জনগণের সামনে তাদেরকে ব্যর্থ হিসেবে উপস্থাপন করা। নিজেদের মন্ত্রণালয় পরিচালনায় তারা অক্ষম; অর্পিত দায়িত্ব পালনে তারা অপারগ— মানুষকে এমনটা বোঝানো। বাস্তবেই কুচক্রী আলী আব্দুল্লাহ সালেহ যা চেয়েছিল তাই হয়েছে।

ধীরে ধীরে ইখওয়ানের বলয় সঙ্কুচিত হয়ে আসলো। সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের অবদান রাখার সুযোগ কমে গেল। অথচ একসময় তারা শাসন ক্ষমতা প্রায় লাভ করেই বসেছিল।

আরব বসন্ত পরবর্তী বাস্তবতায় ইখওয়ান ক্ষমতার বলয় থেকে তো বটেই, ইয়েমেনের ইসলামপন্থার মেহনতে আরো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পরে।

[illegible]

দীর্ঘ প্রায় ৯০ বছর পর, আরব বসন্তের বদৌলতে ২০১১ সালে ক্ষমতায় আরোহণ করা ইখওয়ান এক বছরেও রাষ্ট্রকে ইসলামি আইনের অধীনে আনতে সক্ষম হয়নি। বরং ২০১৩ এর লিবারেল পশ্চিমা বিশ্ব সমর্থিত সামরিক ক্যুয়ের মাধ্যমে ইখওয়ান অপসারিত হয়। প্রেসিডেন্ট মুরসি, মুরশিদে আম মাহদি আকেফ (রহ.) বন্দি অবস্থায় মারা যান। গণহত্যা ও গণবন্দীত্বের এই ফলাফল ইখওয়ানের পরিণতি আলজেরিয়ার ঘটনারই পুনরাবৃত্তিই মাত্র!

[illegible]

জিয়াউর রহমানের আমলে গোলাম আযমের নেতৃত্বে রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করা ইখওয়ানি মানহাজের দল “জামায়াতে ইসলামি” কখনো বিএনপি আবার কখনো আওয়ামী লীগের আশ্রয়ে সামান্য ক্ষমতা চর্চার বাইরে বিশেষ কিছু অর্জন করতে পারেনি।

২০০১ সালে চার দলীয় জোটের অন্যতম শরীক হিসেবে সংসদ ও মন্ত্রীসভায় জামাত নেতাদের অংশ থাকলেও, ৫ বছরে একটিও ইসলামি আইন বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। আর মার্কিনপন্থী বিএনপি কেনই বা তা হতে দিবে?

তারপর ২০০৮ সালের পর আওয়ামী সরকার জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের ফাঁসি দেয়। এবং এক পর্যায়ে দলের নিবন্ধন বাতিল করে। ঠিক যেন ইয়েমেন, আলজেরিয়া আর মিশরেরই পুনরাবৃত্তি।

ব্যর্থ গণতন্ত্রের এমন উদাহরণ অনেক দেয়া যাবে। হয় সেক্যুলার রাজনৈতিক নেতারা মুজাহিদ ও অন্যান্য ইসলামপন্থীদের উত্থান ঠেকাতে আদর্শিক আপসে সম্মত হওয়া ইখওয়ানিদের ক্ষমতার কোণে সাময়িক জায়গা দিয়েছে। অতঃপর আবার ছুঁড়ে ফেলেছে। অথবা কুসুম কুসুম বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর নিরাপদ সংগ্রামীদের কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করেছে।

ইসলামি বিশ্বের পূর্ব থেকে পশ্চিমে অবস্থানকারী সকল ইখওয়ানি ধারার জামাত বা ইসলামি গণতান্ত্রিক দলসমূহের পরিণতি এমনইঃ-

ক) আদর্শের সাথে আপোষ। শরীয়াহর স্থলে সেক্যুলার শাসনেই সন্তুষ্টি,

খ) অন্যথায় গণতান্ত্রিক রাজনীতি থেকেই চিরবিদায়।

তাই, আদতেই যদি কেউ সত্যকে ভালোবাসেন, দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এসে মুক্তমনে ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর গণতন্ত্রের কুফল নিয়ে চিন্তা করেন; তবে ইনশাআল্লাহ বাস্তবতা অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

সবশেষে, ইখওয়ান, জামা`য়াতে ইসলামি বা আন নাহ্দার জন্য শায়খ সামি আল উরাইদির পুরনো কথাটিই স্মরণ করিয়ে দেয়া যায়—

"বুদ্ধিমান তো সেই ব্যক্তি, যে অন্যের পরিণতি দেখে শিক্ষা নেয়। আর নির্বোধ তো সেই ব্যক্তি, যে নিজে আক্রান্ত হয়েও শিক্ষা নেয়না।"

---

[1] পৃষ্ঠা:১১

[2] পৃষ্ঠা:১১

[3] পৃষ্ঠা:১১

[4] পৃষ্ঠা:১২

[5] পৃষ্ঠা:১১

[6] পৃষ্ঠা:১২

[7] কেয়া জুমহুরিয়াত কে যারিয়ে ইসলামি ইনকিলাব মুমকিন হ্যা?- ড. জাভেদ আকবার আনসারি।

ড. জাভেদ আকবর আনসারি একজন বিশিষ্ট পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদ। তিনি লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকস থেকে এমএসসি এবং ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার গবেষণার পরিধি বিস্তৃত—যার মধ্যে রয়েছে আর্থিক ও শিল্প অর্থনীতি (financial and industrial economics), আধুনিক পুঁজিবাদ এবং রাজনৈতিক ও নৈতিক দর্শন।

[8] লেখক প্রবন্ধটি ২০২২ সালের প্রেক্ষাপটে লিখেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামির অবস্থা পূর্বের তুলনায় আরও বেশি করুণ। ক্ষমতার রাজনীতি চর্চা করতে গিয়ে দলটি তার ইসলামি চরিত্র অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি দলটি এখন নিজেদের আধুনিক, লিবারেল ও পুরোদস্তুর গণতান্ত্রিক দল হিসেবে প্রমাণের চেষ্টায় উঠেপড়ে লেগেছে। শুধু

ইসলামপন্থী নয়, সেক্যুলার দলগুলোও জামায়াতে ইসলামিকে পূর্বের ন্যায় আর ইসলামপন্থী সংগঠন হিসেবে মনে করে না। ভুল প্রক্রিয়ার দরুন নির্যাতিত হওয়া কোনো সংগঠন বা আন্দোলনের জন্য অনেক উত্তম, ক্ষমতা বা সাময়িক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে আদর্শ ত্যাগ করার তুলনায়। মোদ্দাকথা, ইসলামপন্থীদের গণতান্ত্রিক রাজনীতির শেষ পরিণতি এটাই—হয় আদর্শ থেকে বিচ্যুতি অথবা আন্দোলন অপ্রাসঙ্গিক বা নি:শেষ হয়ে যাওয়া।

[9] "ইসলামি বিপ্লবের পথ" শীর্ষক বই থেকে গৃহীত

[10] মা যা খসিরাল 'আলাম